প্রশ্ন: কালিদাসের নাট্য প্রতিভা আলোচনা কর।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ এবং বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাস এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কাব্যশিল্পে যেমন তাঁর একক আধিপত্য, নাট্যকলাতেও তেমনি তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের সুকঠিন ও কঠোর বিধিবিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখেও কীভাবে নাটকে জীবনের বহুমুখী বিস্তার, ভাবাবেগ ও নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা যায়—কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

কালিদাস মূলত তিনটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলি হল -

১) **মালবিকাগ্নিমিত্রম্:** এটি কালিদাসের প্রথম নাট্যপ্রয়াস। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি রাজপ্রাসাদের অন্তরে গড়ে ওঠা প্রণয়, ঈর্ষা ও কূটচক্রান্ত নিয়ে রচিত এক রোমান্টিক 'নাটিকা' বা রূপক। বিদর্ভের রাজ্যভ্রষ্ঠ রাজা মাধব সেন ভগিনী মালাবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণের উদ্দেশ্যে তাকে বিদিশায় প্রেরণ করলে পথমধ্যে তিনি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। বিদিশার সেনাপতি বীর সেন তাঁকে দস্যু হস্ত থেকে উদ্ধার করে রাজমহিষী ধারিণীর পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করেন। অগ্নিমিত্র মালবিকা দর্শনে তার প্রতি আকৃষ্ট হলে রাজমহিষী তা জানতে পারেন এবং মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। বিদূষকের সহায়তায় রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। ওদিকে রাজ্যচ্যুত মাধব সেনও রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহিষী ধারিণী মালাধিকার প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে স্বেচ্ছায় অগ্নিমিত্রের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

নাটকটিকে কেবলমাত্র একটা প্রেম কাহিনি বলে মনে করলে ভুল হবে–এই নাটকে তৎকালীন রাজঅন্তঃপুরের বিলাসময় জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, মানব চরিত্রের সংকীর্ণতা ও মহত্বের পরিচয় আছে, আর আছে মানবজীবন, বিশেষ করে ধনী ব্যক্তিদের চরিত্র–চিত্রণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয়।

২) বিক্রমোর্বশীয়ম্: দ্বিতীয় নাটকে কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা আরেক ধাপ অগ্রসর হয়। স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশী ও মর্ত্যের রাজা পুরূরবার প্রণয়কাহিনি এতে উপজীব্য।

শিব পূজান্তে কৈলাস থেকে প্রত্যাবর্তন কালে অপ্সরা উর্বশী দৈত্যহস্তে যখন নিপীড়িতা, তখন সূর্য পূজান্তে প্রত্যাবৃত্ত রাজা পুরুরবা তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে প্রেমে পড়েন। পুরুরবার প্রতি তন্ময়তা বশত অভিনয় কালে একদা উর্বশী ভুল করলে আচার্য ভরত তাকে অভিশাপ দেন স্বর্গে তার স্থান হবে না। দেবরাজ ইন্দ্র সেই অভিশাপ বরে রূপান্তরিত করে পুরুরবা পুত্রমুখ না দেখা পর্যন্ত মর্ত্যে উর্বশী তাঁর সঙ্গে সংসার জীবনে রত থাকবেন এমন নির্দেশ দিলেন। যথা সময়ে পুরুরবা পুত্রমুখ দর্শন করলে উর্বশীর শাপমোচন হওয়াতে তার স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আয়োজন শুরু, পুরুরবা মনভরে বাণপ্রস্থ অবলম্বনে সম্মত হলেন কিন্তু নারদ সংবাদ আনলেন দেবসুরের যুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করতে হবে। ফলত ইন্দ্র চিরকাল উর্বশীকে পুরুরবার সহধর্মিণী রূপে থাকবার আদেশ দিয়েছেন।

নাটকে কালিদাসের নাট্যকল্পনার অগ্রগতি দেখা যায়, বেদ পুরাণ, শোককথা– যেখান থেকেই তিনি উপাদান সংগ্রহ করুন না কেন কাহিনি গ্রন্থনে তিনি মৌলিকতা দেখাতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী কবিতায় যেকথা বলেছেন তা এখানে উর্বশীর 'বধূ' রূপটির পরিচয় আছে বটে তবে তা অর্ধসমাপ্ত। উর্বশীর প্রেমে না আছে স্বভাবের সংযম, না আছে মাতৃত্বের গৌরব–আছে কেবল স্বার্থপরতা, নায়ক পুরুরবার প্রেমিকা সত্তার পরিচয় পাওয়া গেলেও তার রাজোচিত মহিমা প্রেম পারবশ্যতার জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

৩) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্: বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত কালিদাসের এই নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়, অভিশাপজনিত বিরহ ও আত্মিক পুনর্মিলনের মাধ্যমে নাট্যকার প্রেমকে শারীরিক আকর্ষণের ঊর্ধ্বে তুলে পরম আধ্যাত্মিক সুষমায় উন্নীত করেছেন। নাটকটি কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতির নিদর্শন। বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে সংগৃহীত হলেও কাহিনি গ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণে কালিদাস যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের সহজ সরল কাহিনি কালিদাসের দক্ষ হাতে নানারকম জটিলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরিণত লাভ করেছে। অথচ কোনো চরিত্র কোনো ঘটনাই অবিশ্বাস্য, অবাস্তব মনে হয়নি। মহাভারতের দুষ্মন্তের

পূর্বকথা মনে এলেও তিনি সপুত্র শকুন্তলাকে না চিনতে পারার ভান করে মিথ্যাবাদী হয়েছেন–কালিদাস অপূর্ব উপায়ে রাজার চরিত্রটি রক্ষা করেছেন, তিনি দুর্বাসার শাপের প্রসঙ্গটি এনে নাটকে নতুন তাৎপর্য এনে দিয়েছেন, নাটকের নামকরণকালেই তিনি অভিজ্ঞান, অর্থাৎ রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন–এই আংটি শকুন্তলা তথা দুষ্মন্তের জীবনের সুখ, দুঃখ এবং পুনর্মিলনের আনন্দের কারণ হয়েছে। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "শকুন্তলার কাহিনি এই আংটির ছোঁয়াতেই অসামান্যতা পাইয়াছে।"

কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ-

ক. প্রকৃতি ও মানবচেতনার একাত্মতা: কালিদাসের নাটকে প্রকৃতি কোনো বাহ্যিক পটভূমি মাত্র নয়; তা চরিত্রগুলোর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষ করে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে আশ্রম–প্রকৃতি শকুন্তলার সহোদরা সদৃশ। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করে, তখন তপোবনের হরিণ শিশুরা খাদ্য গ্রহণ ভুলে যায়, ময়ূর নাচ বন্ধ করে দেয় এবং লতা–পাতা থেকে যেন অশ্রুপাত ঘটে। বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানবীয় অনুভূতিকে এভাবে একসূত্রে বেঁধে দেওয়া কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার এক অনুপম নিদর্শন।

খ. রস পরিবেশন ও 'শৃঙ্গার' রসের প্রাধান্য: নাট্যশাস্ত্রীয় বিধি মেনে কালিদাস তাঁর নাটকে মুখ্য রস হিসেবে শৃঙ্গার রসকে বেছে নিয়েছেন। তবে তাঁর কাছে শৃঙ্গার কেবল ভোগাসক্তি নয়—তা ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ। তবে নাটকে করুণ, বীর ও শান্ত রসের সুনিপুণ সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি মূল শৃঙ্গার রসকেই আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

গ. চরিত্রচিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা : কালিদাস চরিত্র চিত্রণে অসাধারণ মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলো কেবল নাট্যশাস্ত্রের ছকে বাঁধা নয়; তারা রক্তমাংসের মানুষ। দুষ্যন্ত বা পুরুরবা কেবল উদাত্ত ধীর নায়ক নন, তাঁদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব, বিরহবেদনা ও মানবীয় দুর্বলতা স্পষ্ট। শকুন্তলা, মালবিকা ও উর্বশীর চরিত্রায়নে কালিদাস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিশেষত শকুন্তলার মুগ্ধা হরিণীর মতো

সরলতা থেকে বিরহ-তপস্বিনী জননীতে রূপান্তরিত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক যাত্রাটি বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

ঘ. নাট্য-গঠনরীতি ও নাট্যিক উৎকণ্ঠা: কালিদাস নাটকের কাহিনীর গতি বজায় রাখতে নানাবিধ নাট্যিক কৌশল ব্যবহার করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে আংটি এবং দুর্বাসা মুনির অভিশাপ কেবল নাটকীয় মোড় ঘোরায় না, তা দুষ্যন্তের চরিত্রকে কলঙ্কযুক্ত হতে রক্ষা করে। নাটকে কোনো ঘটনা সরাসরি না দেখিয়ে বিষ্কম্ভক বা প্রবেশকের মাধ্যমে নাট্যিক তথ্য পরিবেশন তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান কৌশল।

ঙ. কাব্যাত্মক ভাষা ও 'বৈদর্ভী' রীতি: কালিদাসের নাটকে গদ্য ও পদ্যের ভারসাম্য অসাধারণ। তিনি মূলত বৈদর্ভী রীতি (সহজ, সরল, মাধুর্যপূর্ণ ও সমাসহীন/স্বল্পসমাসযুক্ত গদ্য-পদ্য) অনুসারী। তাঁর নাট্য সংলাপে অলংকার, ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্য এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে সংলাপগুলো কবিতার অনুভূতি এনে দেয়। "উপমা কালিদাসস্য" — কালিদাসের উপমা প্রযোগের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। নাটকে তিনি প্রকৃতির উপাদান থেকে এমন অসাধারণ ও প্রাঞ্জল উপমা প্রয়োগ করেছেন যা মূল ঘটনাকে এক লহমায় প্রসংগত ও জীবন্ত করে তোলে।

চ. আদর্শবাদ ও বাস্তবানুভূতির ভারসাম্য: কালিদাস তাঁর নাটকে জীবনকে যেমন দেখেছেন, তেমনি জীবনের এক উচ্চতর আদর্শকেও রূপায়িত করেছেন। তাঁর নাটক ভারতীয় দর্শনের 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ'—এই চতু বর্গ ফলপ্রাপ্তির আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু এই আদর্শ স্থাপন করতে গিয়ে তিনি বাস্তব জীবনের নানাবিধ রূপকে চেপে যাননি। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র, ধীবর (জেলে) ও রক্ষীদের কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তব ও অনাবিল চিত্র তিনি নাটকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা ভারতীয় সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মহাসমারোহে গৃহীত হয়েছে। স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইংরেজিতে অনুবাদ করার পর পশ্চিমা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। জার্মান মহাকবি গ্যেটে শকুন্তলা নাটক পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন-

"তুমি যদি দেখতে চাও তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল,যা মুগ্ধ করে ও প্রলুব্ধ করে,যা তৃপ্তি দেয় ও পুষ্ট করে,তুমি যদি স্বর্গ ও মর্ত্যকে এক নামেই ব্যক্ত করতে চাও—তবে আমি 'শকুন্তলা'র নামই উচ্চারণ করব এবং সেখানেই সবকিছু বলা হয়ে যাবে।"

কালিদাস কেবল কাব্যময় সংলাপ দিয়েই নাটক সাজাননি; বরং মানবহৃদয়ের সুক্ষ্মতম অনুভূতি—প্রেম, বিরহ, সন্তানবাৎসল্য ও প্রকৃতিপ্রীতিকে নাটকের ফ্রেমে এক চিরন্তন রূপ দিয়েছেন। সংস্কৃত নাট্যধারায় তাঁর স্থান একক ও অদ্বিতীয়, এবং বিশ্বনাট্যের ইতিহাসেও তিনি এক চিরভাস্বর মহান নাট্যকার।